তারিখ : 10 MAY 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিও নিয়ে দেদার অনিয়ম

শরীফুল আলম সুমন ▶

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী কোনো স্কুল বা কলেজে ৩০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক থাকার বিধান রাখা হয়েছে। একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা কলেজে এমপিওভুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা ১৫ জন হলে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অন্তত ৪৫০ জন শিক্ষার্থী থাকার কথা। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া কোথাও এত সংখ্যক শিক্ষার্থী নেই। এমনকি অনেক স্কুলে এমপিওভুক্ত শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম। তার পরও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) প্রতি দুই মাস পরপর শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করছে। আবার কাছাকাছি স্কুল-কলেজ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক তদবিরে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও দেওয়া হয়েছে। শুরুতে সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চার-পাঁচজন শিক্ষককে এমপিও দেওয়া হলেও পরবর্তী সময় অন্য শিক্ষকদেরও এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে। এতে দিন দিন এমপিওর পেছনে সরকারের খরচ বেড়েই চলছে। এমপিওর ব্যয় মেটাতে গিয়ে অন্যান্য ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এক হিসেবে দেখা যায়, প্রায় ৩০ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঁচ লাখ শিক্ষকের বেতন-ভাতার পেছনে সরকারের ব্যয় হচ্ছে বছরে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা। অথচ শিক্ষাবিদরা বলছেন, এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান সবচেয়ে খারাপ। এসব বিষয়ে মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এমপিও নিয়ে আমরা বেশ বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছি। শিক্ষার্থী কম হলেও যেসব শিক্ষককে এমপিওভুক্তি করা হয়েছে তাঁদের এমপিও বাতিলের সুযোগ কম। তবে নতুন যারা এমপিওভুক্তির আবেদন করছে তাদের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ের কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যাতে নতুন করে এমপিওর বোঝা বইতে না হয়।'

আটজন এমপিওভুক্ত শিক্ষকের কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ১৬ জন। খুলনার রূপসা মহিলা কলেজের এমন চিত্রই পাওয়া গেছে। এই কলেজে শিক্ষার্থী না বাড়লেও সম্প্রতি আরো আটজন শিক্ষক নিয়োগ দেয় পরিচালনা পর্ষদ। তাদের এমপিওভুক্তির জন্যও মাউশিতে আবেদন করা হয়েছে। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই সম্প্রতি মাউশির সহকারী পরিচালক (কলেজ-২) এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার কলেজটিতে সরেজমিন পরিদর্শনে যান। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের পরিদর্শনে কাগজে-কলমে ১৬ জন শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব পাই। যদিও সব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের দেখা আমরা কলেজে পাইনি। এ কলেজের গত বছরের এইচএসসির ফলাফলও ভালো নয়। মাত্র ছয়জন শিক্ষার্থী পাস করেছে।'

জানা যায়, মাত্র ১৬ জন ছাত্রী থাকার পরও কলেজের এমপিও বাতিলের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার মাউশির নেই। এটা শুধু মন্ত্রণালয়ই নিতে পারে। অধিকাংশ স্কুল-কলেজ এমপিওভুক্তির পেছনে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা থাকে। তাই একবার কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়ে গেলে তা সাধারণত আর বাতিল করা হয় না। বিশেষ কারণে কোনো শিক্ষকের এমপিও বাতিল করলেও তাঁরা মামলা করেন। আর প্রায় সব মামলার রায়ই শিক্ষকদের পক্ষে যায়। তখন বকেয়াসহ শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করতে হয়। বর্তমানে শিক্ষকদের দায়ের করা এমপিও-সংক্রান্ত সাড়ে আট হাজার মামলা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘাড়ে ঝুলছে।

সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকার ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে মন্ত্রণালয়

সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'কিছুদিন আগে আমি একটি স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে বিজ্ঞানের শিক্ষকের সংখ্যা ছিল পাঁচজন। অথচ বিজ্ঞানে ছাত্র আছে মাত্র একজন। আমি যেদিন গিয়েছি সেদিন ওই ভাগ্যবান ছাত্রটি স্কুলে উপস্থিত ছিল না। অনেক স্কুল-কলেজেই এমপিওভুক্ত শিক্ষকের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম। তাদের এমপিও স্থগিত করলেই মামলা খেতে হয়। শিক্ষকদের ব্যাপারে আরেকটু কঠোর হলে মামলার সংখ্যা সাড়ে আট হাজার থেকে ৮০ হাজার হয়ে যাবে। তখন বকেয়াসহ এমপিওভুক্তির সব টাকাই ফেরত দিতে হবে। শিক্ষা খাতের বাজেটে অনেক টাকা দেখা গেলেও শিক্ষকদের বেতন দিয়ে অবশিষ্ট তেমন কিছুই থাকে না।'

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত অপর এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'এমপিও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে। দেশের প্রায় ৩০ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যার মধ্যে অধিকাংশই ভুঁইফোড়। উত্তরাঞ্চলে এমনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ১০ জন শিক্ষার্থী অথচ এমপিওভুক্ত শিক্ষক পাঁচজন। অনেকে হঠাৎ করে একটা স্কুল দিয়ে পরবর্তী সময় এমপিও করে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করেন। প্রথমে শিক্ষা ব্যবস্থায় এমপিওর অবদান থাকলেও এখন একেবারেই নেই।'

এমপিও নিয়ে মাউশির বর্তমান অবস্থা : এমপিওভুক্তি নিয়ে মাউশির বেশ কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে মাঠপর্যায়ে কর্মরত ডিলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে শুরু করে পরিচালক ও পিয়ন পর্যন্ত রয়েছেন। সম্প্রতি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ) দেশের ৪৩টি জেলার শতাধিক কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পরিদর্শন করে মোট ১০৬ জন জাল সনদধারী শিক্ষক চিহ্নিত করেছে। জাল সনদধারী হিসেবে চিহ্নিত ১০৬ শিক্ষক তিন কোটি ৩৪ লাখ ৮৭ হাজার ৭১৯ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা হিসেবে তুলে নিয়েছেন। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রতিবেদনে বলেছেন, প্রায় ১০ শতাংশ শিক্ষকই জাল বা ভুয়া সনদ দিয়ে দিব্যি চাকরি করে যাচ্ছেন। সে হিসেবে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষকই জাল সনদে চাকরি করছেন।

ডিআইএর এ প্রতিবেদন থেকেই মাউশির এমপিও বাণিজ্যের চিত্র ফুটে ওঠে। প্রতিদিনই মাউশিতে শত শত শিক্ষক এমপিওভুক্তির খোঁজ-খবর নিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধরনা দিচ্ছেন। অথচ নিয়মানুযায়ী দুই মাস পরপর মিটিংয়ে এমপিওভুক্তি দেওয়া হয়। এতে শিক্ষকদের মাউশিতে আসার প্রয়োজন পড়ে না। অভিযোগ রয়েছে, মাউশির একজন পরিচালক, সহকারী পরিচালক ও উপপরিচালক টাকা ছাড়া এমপিওর ফাইল ছাড় করেন না। টাকা নেওয়ার জন্য তাদের নির্দিষ্ট সিন্ডিকেট রয়েছে। গত মাসে সেই সিন্ডিকেট সদস্য ও মাউশির পিয়ন বাবর আলীর কাছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ টাকার ব্যাগ এবং তা হারিয়ে যাওয়া নিয়ে তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। জানা যায়, টাকা হলে মাউশির এই সিন্ডিকেট প্রয়োজনীয়তা যাচাই ছাড়াই শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির ব্যবস্থা করেন। কোনো শিক্ষক অবসর গ্রহণ করলে, চাকরি ছাড়লে, মৃত্যুবরণ করলে বা নতুন বিষয় চালু হলে নতুন শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা হয়। যদি ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম হয় তাহলে নতুন শিক্ষককে এমপিওভুক্তির প্রয়োজন পড়ে না। অথচ টাকার বিনিময়ে যথেচ্ছভাবে শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির ব্যবস্থা করে ওই সিন্ডিকেট।

এসব বিষয়ে মাউশির মহাপরিচালক বলেন, 'পিয়ন বাবর আলীর কাছে টাকা পাওয়া এবং তা হারিয়ে যাওয়া নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি এখনো রিপোর্ট দেয়নি। বাবর আলী বলছে, তার ব্যাগে খুব বেশি টাকা ছিল না তবে কয়েকজন শিক্ষকের বেতনের চেক ছিল।' আর নিয়মবহির্ভূত এমপিওভুক্তির অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, 'যাচাই বাছাই করেই সব করা হয়।'